বিদ্যাসাগরের কর্মপদ্ধতি ও কৌশল : প্রসঙ্গ শিক্ষা ও সমাজসংস্কার

ফাতেমা-তুজ-জোহরা*

[সারসংক্ষেপ : শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। বিধবাবিবাহের প্রচলনের মাধ্যমে তিনি নারীমুক্তির অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রেও নিয়েছেন বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। বহুবিবাহপ্রথা বাতিল করার জন্যও তিনি আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন; বাল্যবিবাহের কুফল নিয়েও ছিলেন সরব। ঔপনিবেশিক শাসনামলে শাসক শ্রেণিকে তাঁর সংস্কার কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে তাঁকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে; সনাতন রক্ষণশীল সমাজের সমালোচনা ও বিরূপ আচরণকে সামাল দিতেও নিতে হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ– যাতে তাঁর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগরের কীর্তির মূল্যায়ন এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি ও কৌশল বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় তুলে ধরা।]

ভূমিকা

সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালির ত্রাতারূপে আবির্ভূত এক স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৯৯১)। বিশেষ করে সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন পদে এবং দক্ষিণ বাংলার শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি শিক্ষা সংস্কারে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনে তিনি পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে লিখছেন প্রবন্ধ। বহুবিবাহ রহিতকরণেও করেছেন সর্বোচ্চ চেষ্টা। "বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী" এই মহৎ ব্যক্তিত্ব বাংলা গদ্যের সংস্কার করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের বাধার সম্মুখীন না হলেও, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে নানামুখী বাধা ও আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসককে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হয়েছে, অন্যদিকে রক্ষণশীল সনাতন সমাজের বাধার মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। সংস্কার প্রসঙ্গে শাসকশ্রেণি তাঁর সঙ্গে কখনো ঐক্যমত্যে পৌঁছলেও অনেক ক্ষেত্রেই মতদ্বৈধতার কারণে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েও এগিয়ে নিতে হয়েছে তাঁর কার্যক্রম। অনেকটা জেদি ও একগুঁয়ে হিসেবে পরিচিত বিদ্যাসাগর, মতের মিল না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই যেমন প্রয়োজনে পদত্যাগ করেছেন; তেমনি বিপরীত চিত্র হিসেবে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশেও তাঁকে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে দেখি। ফলে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে আত্মপ্রত্যয়ী স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরকে কখনো কখনো নিজ অবস্থান থেকে নমনীয় হতে হয়েছে। মূলত সংস্কারের প্রয়োজনে উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে নানারকম কর্মকৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে– যা তাঁর সংস্কার উদ্যোগকে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা সংস্কার

বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় পাঁচ বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এরপর পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসে "কয়েক মাস পাঠশালে পড়িবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেন" (শিবনাথ, ১৯৮২ : ১৭)। ১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়ে উত্তীর্ণ হন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদ শূন্য হলে বিদ্যাসাগর সেই পদে যোগ দেন। এসময় থেকেই তিনি শিক্ষা সম্পর্কিত নানা বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কলেজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেক্রেটারি রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কারণ বিদ্যাসাগর "শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যেসব প্রস্তাব করিতেন, তাহা সময় সময় সেক্রেটারীর অনুমোদিত হইত না" (বিহারীলাল, ১৯৯১ : ১১৪)। তাই উক্ত পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণে বিদ্যাসাগরকে অর্থকষ্টে পড়তে হয়। এসময় তাকে প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা ঋণ করে বাড়িতে পাঠাতে হয়েছে। তাছাড়া রসময় দত্ত ছিলেন পারিবারিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি। এমন একজনের সঙ্গে দ্বৈরথে লিপ্ত হয়ে পদত্যাগ করার সাহস সবার থাকে না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সেই সৎসাহস দেখাতে পেরেছে। কারণ সংস্কৃত কলেজে চাকরি শুধু তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল না; এটি ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শন ও মতাদর্শ বাস্তবায়নের স্বনির্বাচিত ক্ষেত্র। তাই জীবিকাচিন্তাকে পরিত্যাগ করে তিনি সহজেই পদত্যাগ করতে পেরেছেন। বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগরের এ রকম সৎসাহস দেখে মন্তব্য করেন : অনন্যোপায় সামান্যবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ পদত্যাগ দুষ্কর নিশ্চিতই; কিন্তু যাঁহাদের ভিতরে তেজ আছে, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিচিত্র কিছুই নহে (বিহারীলাল, ১৯৯১ : ১১৪–১১৫)।

বস্তুত তিনি পদত্যাগ করেছিলেন বলেই তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা লাভ করে।

১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরানি পদে যোগ দেন মাসিক ৮০ টাকা বেতনে। ১৮৫০ সালেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের চাকরি নিয়ে চলে যান– শূন্য হয় সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ। এসময় বাংলার শিক্ষা সংসদের সচিব এফ.জে. ময়েট সেই পদে বিদ্যাসাগরকে নিয়োগ দিতে চান। নিয়োগের কথা জানতে পেরে বিদ্যাসাগর স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে, কেবল চাকরি লাভের জন্য এই দায়িত্ব নিতে তিনি অনাগ্রহী। শুধু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও গুণগত পরিবর্তন করার ক্ষমতা পেলেই তিনি সেই পদে যোগদান করবেন। বিদ্যাসাগরের দৃঢ় অবস্থান ও আত্মবিশ্বাসকে সম্মান জানিয়ে সরকার তাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়। নিয়োগের সময় বিদ্যাসাগর শর্তারোপ করেছিল যে, আপাতত অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিলেও সুযোগ সৃষ্টি হলেই তাঁকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিতে হবে। "বিদ্যাসাগরের এই শর্তারোপ সংস্কৃত কলেজের নিছক অধ্যক্ষ হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের কোনো প্রচেষ্টা ছিল না; তিনি মূলত চেয়েছিলেন কর্তৃত্ব" (বিশ্বজিৎ, ২০২০ : ২৫)। আর এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গ্রহণের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলের একটি দিক। তিনি অনুভব করেছিলেন, এই কর্তৃত্ব না পেলে পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া তিনি যে ক্ষমতা ও পদের প্রতি অনুরক্ত নন, ইতঃপূর্বে রসময় দত্তের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কারণে পদত্যাগের ঘটনা থেকে স্পষ্টতই আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি।

বিদ্যাসাগরের এই জেদ, আত্মপ্রত্যয় ও মনোবল ইংরেজ সরকারের কাছে শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক ধারণা তৈরি করে। তাই ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারি বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব নিয়েই তিনি উপলব্ধি করেন, ঔপনিবেশিক কাঠামোয় বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় নানামাত্রিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য এসময় নানান উদ্যোগ ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করতে থাকেন তিনি। অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে তিনি যে সংস্কারকর্মগুলো গ্রহণ করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১. প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণ, ২. ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য বর্ণের ছাত্রদের কলেজে লেখাপড়া করার সুযোগ প্রদান, ৩. ছাত্রদের বেতন গ্রহণের রীতি প্রবর্তন, ৪. উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন, ৫. দুই মাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রথা প্রবর্তন, ৬. সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন ইত্যাদি। ১৮৫২ সালের ১২ই এপ্রিল বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংসদের সচিব এফ.জে. ময়েটের কাছে ২৬টি অনুচ্ছেদসংবলিত একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। 'নোটস্ অন দ্য সংস্কৃত কলেজ' শিরোনামের এই পরিকল্পনার প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি উল্লেখ করেন যে, "বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা" (বিনয়, ২০১১ : ১৭৩)। এই পরিকল্পনাপত্রে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রম, পাঠ্যবইয়ের ভাষা, পঠিতব্য বিষয়সমূহ, শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণ, কলেজের অর্থব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত মত প্রদান করেন। সর্বশেষ (২৬ নং) প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেন যে, তাঁর সংস্কার প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে সংস্কৃত কলেজের যেমন কোনো উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তেমনি তার প্রকৃত আদর্শও বাস্তবে রূপায়িত হবে না (বিনয়, ২০১১ : ১৭৬)। বাংলার ছোটোলাট হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনা নিজের মন্তব্যসহ শিক্ষাসংসদে পাঠিয়েছিলেন; যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'It is the result of several consultations I have held with the Principal and, I lay it before the council as deserving, in my humble judgement, of very careful consideration' (বিনয়, ২০১১ : ১৭৬)। এই সুপারিশের প্রায় এক বছর পর বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ড. ব্যালান্টাইনকে শিক্ষা সংসদ সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৫৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে একজন পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে এসে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করেন ব্যালান্টাইন। কলেজ পরিদর্শনশেষে ব্যালান্টাইন শিক্ষা সংসদের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যমান সংস্কৃত ও ইংরেজি– উভয় প্রকার পাঠপদ্ধতিকে ভালো হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। ব্যালান্টাইন তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে ইংরেজি ও সংস্কৃত– এই দুই ভাষায় ছাত্ররা জ্ঞানবিদ্যার চর্চা করার ফলে তাদের ধারণা জন্মাতে পারে যে, সত্য দুই রকমের। বিদ্যাসাগর এই মত মেনে নিতে পারেননি। এছাড়া ব্যালান্টাইন সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমে বিশপ বার্কলের ভাববাদী দর্শন সংযুক্ত করতে বলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া মতের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি। তাই তিনি ব্যালান্টাইনের যুক্তিখণ্ডন করে পাঠ্যসূচিতে বস্তুবাদী দার্শনিক স্টুয়ার্ট মিলের যুক্তিবিদ্যা পাঠ্য করতে চান। বিদ্যাসাগর তাঁর আয়াসসাধ্য পরিকল্পনায় অন্যের হস্তক্ষেপ, বিশেষ করে তাঁর সমমর্যাদার একজন ইংরেজ অধ্যক্ষের আধিপত্য মানতে পারেননি। এ বিষয়ে তিনি ড. ময়েটকে তাঁর অনুযোগ ও ক্ষোভ জানিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা সংসদের সমর্থন চান। এ সময় বিদ্যাসাগর

ময়েটকে লেখেন, "এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি যে সংসদের উৎসাহ ও সমর্থন থাকলে, আমি কয়েক বছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি ক'রে দিতে পারব, যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিদ্যার প্রসারে, আপনাদের প্রাচ্য-বিদ্যার অথবা শুধু ইংরেজিবিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে, অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে" (বিনয়, ২০১১ : ১৮২)। সরকার শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের দাবি মেনে নেয়। এই বিতর্কের পর সাময়িকভাবে হলেও বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান। অনেকের হয়তো মনে হতে পারে বিদ্যাসাগর ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে বিবাদ ও বিতর্কে জড়িয়ে তাঁর পেশা ও সংস্কারকর্মকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছিলেন। আমাদের বিশ্লেষণে, এই বিতর্ক তাঁর ভবিষ্যৎ সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরই কৌশল। কারণ সংস্কার শুরুর প্রথম দিকেই তিনি যদি ব্যালান্টাইনের অভিমতকে মেনে নিতেন, তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো সংস্কারসম্পর্কিত সকল ভিন্নমতকে মেনে নিতে হত। নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকা বিদ্যাসাগরের জেদি চারিত্র্যকে প্রকাশ করলেও সরকারের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ় অবয়বও চিত্রিত হয়ে ওঠে। ফলে সরকার বুঝতে পারে যে, বিদ্যাসাগর যে সংস্কার প্রস্তাব পেশ করেন, তা গভীর চিন্তা ও পরিপক্ব পরিকল্পনার মাধ্যমেই করেন। নিজের সংস্কার পরিকল্পনাকে সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য স্বমতে অনড় থাকাও তাই জরুরি ছিল।

১৮৫৭ সাল থেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শিক্ষাসংসদের নানা কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক নিয়োগদানের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর একক কর্তৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন। শূন্য পদের কোনো বিজ্ঞাপন না দিয়ে তিনি সাহিত্য ও গণিতের অধ্যাপক হিসেবে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও মোহিনীমোহন রায়কে নিয়োগ দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নচন্দ্র রায়কে। শিক্ষা বিভাগের পরিচালক গর্ডন ইয়ং এই নিয়োগকে মেনে নিলেও, ভবিষ্যতে নিয়োগবিধি অনুযায়ী শূন্য পদের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিতে পরামর্শ দেন। নিয়ম-নীতির দিক থেকে বিবেচনা করলে গর্ডন ইয়ংয়ের পরামর্শ যৌক্তিক। তবে বিজ্ঞাপন ছাড়া শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার পেছনেও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারকৌশল লক্ষণীয়। এ বিষয়ে বিনয় সেনের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

> শিক্ষক-অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারেও তিনি যে পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করেছেন, তার কারণ মনে হয়, শিক্ষা বিভাগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। তিনি জানতেন, তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজে কাজ করার পথে অন্তরায় অনেক। তার উপর তাঁর সহযোগীদের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের কর্তারা যদি প্রকাশ্য মনোনয়নের সুযোগ নিয়ে নিজেদের তাঁবের লোক দু-চারজন ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তা হলে পদে-পদে নানা রকমের বাধা পেয়ে একেবারেই কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না। (বিনয়, ২০১১ : ১৮৫)

এ কারণে আমরা বুঝতে পারি, বিদ্যাসাগরের এই কর্মপদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারিতা মনে হলেও, সংস্কৃত কলেজের সংস্কার কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গর্ডন ইয়ঙের সাথে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক এরপর আরও দ্বন্দ্বময় হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালের ১৩ই এপ্রিল বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে ইয়ং বাংলা পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর দায়িত্ব 'স্কুল বুক সোসাইটি'কে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর তখন একজন প্রধান পাঠ্যবই রচয়িতা। এছাড়াও তিনি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি'র মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকও। পাঠ্যবইয়ের ওপর বিদ্যাসাগরের একক আধিপত্য খর্ব করার জন্য ইয়ং এ কাজ করেন। বিদ্যাসাগর ইয়ঙের এ চিঠিকে ইতিবাচকভাবে নেননি। তাই ইয়ঙের চিঠিকে কোনো গুরুত্ব দেননি তিনি। ফলে ইয়ং বিদ্যাসাগরের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। এরপর সিপাহী বিদ্রোহের সময় সরকার কলকাতার বিভিন্ন বড়ো বড়ো অট্টালিকাকে সৈন্যসমাবেশের স্থান হিসেবে বেছে নেয়। সে কারণে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের বৃহৎ অট্টালিকাকেও দখলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তও বিদ্যাসাগর মেনে নিতে পারেননি। তাই কলেজের অট্টালিকার দখল ছাড়তে অসম্মতির কথা জানিয়ে সরকারকে চিঠি লেখেন। বাংলা সরকারের সচিব বিদ্যাসাগরের চিঠির উত্তরে ১৮৫৭ সালের ১৭ই আগস্ট একটি চিঠি লিখেন। সেখানে দেরি না করে গ্যারিসান-কমান্ডারের কাছে তাঁকে "বিদ্যালয় গৃহ ছেড়ে দেবার" (বিনয়, ২০১১ : ১৮৬)। জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সরকারি সিদ্ধান্তকে তিনি আর কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবেন না। তাই শিক্ষা বিভাগের নির্দেশ মেনে কলেজের ভবন ছেড়ে দেন এবং বৌবাজার স্ট্রিটে দুটি ভাড়া বাড়িতে অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে কলেজের ক্লাস চালিয়ে নেন। এতদিন আমরা নিজ অবস্থানে অনড় বিদ্যাসাগরকে পেলেও, এখানে আমরা একজন নমনীয় বিদ্যাসাগরকে পাই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, না চাইলেও সরকার কলেজভবন দখল করে নেবে। তাই তিনি এসময় সরকারকে সহযোগিতা করার কৌশল অবলম্বন করেন।

এরপর শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে মতবিরোধ বৃদ্ধি পেলে বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন যে, তিনি আর স্বাধীনভাবে সংস্কারকাজ চালাতে পারবেন না। তাই তিনি শুধু বেতন পাওয়ার জন্য চাকরিতে থাকতে চাইলেন না। ফলে ১৮৫৮ সালের ৫ আগস্ট শিক্ষা বিভাগের পরিচালকের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন। একই বছর ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর পদত্যাগপত্র মঞ্জুর হয়। সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন পদে চাকরিরত অবস্থায় শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক মোট চারটি পরিকল্পনাপত্র পেশ করেন তিনি। সহকারী সম্পাদক পদে থাকার সময় একটি, সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে একটি, অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় হ্যালিডের মাধ্যমে পেশকৃত একটি ও ব্যালান্টাইনের অভিমত প্রসঙ্গে একটি পরিকল্পনা আমরা লক্ষ করেছি। এসব পরিকল্পনাপত্রের মূল সুর প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেন :

> এই সব পরিকল্পনার ভিতরে আলোচনাপ্রসঙ্গে শিক্ষাদর্শের যে মূলসুরটি সর্বত্র ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, সেটি হল মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার এবং উন্নত বাংলাভাষার ভিত্তির উপর সুসমৃদ্ধ নতুন বাংলা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসাগরের সমস্ত শিক্ষাচিন্তার মূল উৎস ও প্রেরণা হল এই আদর্শ। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি সংস্কৃতবিদ্যা ও ইংরেজিবিদ্যা, অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা দুয়েরই আন্তরিক অনুশীলনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'ওরিয়েন্টালিস্ট' বা 'অ্যাংলিসিস্ট' কারও পদাঙ্ক তিনি অনুসরণ করেননি, উভয়েরই যুক্তিতর্ক তাঁর কাছে একপেশে মনে হয়েছে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার এইটাই হল প্রধান বৈশিষ্ট্য। (বিনয়, ২০১১ : ১৮৮)

বাংলা মাধ্যম ও নারীশিক্ষা সংস্কার

১৮৫৫ সালের ১ মে থেকে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বের পাশাপাশি দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়গুলির জন্য সহকারি পরিদর্শক নিযুক্ত হন। তাঁর কাজ ছিল গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত স্থানে মডেল স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় গুণী

শিক্ষকের অভাববোধ থেকে তিনি ১৮৫৫ সালের ১৭ জুলাই স্থাপন করেন নর্মাল স্কুল। নর্মাল স্কুলে মূলত শিক্ষকদের, বিশেষ করে বাংলা স্কুলের জন্য শিক্ষকদেরকে উপযুক্ত করে তোলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। সহকারী পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ২০টি মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এসব বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তিনি বাংলা শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তার ঘটাতে ভূমিকা রাখেন। ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫ মে পর্যন্ত সময়ে তিনি হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের শুরুতে সরকারের কাছে তিনি আশ্বাস পেয়েছিলেন যে, বিদ্যালয়ের ঘরগুলো যদি গ্রামবাসী নির্মাণ করে দেয়, তাহলে বাকি ব্যয় সরকার দেবে। কিন্তু ১৮৫৮ সালের মে মাস পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতন বাবদ ৩৪৩৯.৫০ টাকা বাকি পড়ে যাওয়ার পর, বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে আশানুরূপ সহযোগিতা পাননি। শেষ পর্যন্ত একাধিক চিঠিপত্র বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করলেও, সরকার এই বিদ্যালয়গুলির পরবর্তী ব্যয় চালিয়ে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাতে দমে যাননি। "বালিকা-বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য তিনি একটি নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুললেন; তাতে নিয়মিত চাঁদা দিতে লাগলেন কয়েকজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক। সেই চাঁদার টাকায় বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন" (ইন্দ্র, ২০০১ : ২২০)।

১৮৪৯ সালের ৭ মে বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। তিনি ও তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হয়েও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন ও প্রসারে অবদান রাখেন। ১৮৬৬ সালে ইংল্যান্ড থেকে নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন মিস মেরি কার্পেন্টার। তৎকালীন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন অ্যাটকিনশন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মেরি কার্পেন্টারের পরিচয় করিয়ে দেন। বিদ্যাসাগরের কাছে নারীশিক্ষা নিয়ে কার্পেন্টার বিভিন্ন পারমর্শ নিতেন, একত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শনেও যেতেন। কিন্তু বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নর্মাল স্কুল চালু করা নিয়ে দুজনের মতপার্থক্য তৈরি হয়। শিক্ষাসংস্কার করতে গিয়ে বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজমানস সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ বিদ্যাসাগর নর্মাল স্কুল সম্পর্কে ছোটোলাট উইলিয়াম গ্রেকে বলেন :

> এদেশের ভদ্রপরিবারের হিন্দুরা যখন অবরোধপ্রথার গোঁড়ামির জন্য দশ-এগার বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই গৃহের বাইরে যেতে দেয় না, তখন তারা যে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করতে সম্মতি দেবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। বাকি থাকে অসহায় অনাথা বিধবারা, এবং তাদেরই একাজে পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষকতার কাজে তারা কতদূর উপযুক্ত হবে আপাতত সে-প্রশ্ন বাদ দিয়েও আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বিধবারা যদি সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগ দেয়, তাহলে লোকের কাছে তারা অবিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠবে। তা যদি হয় তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। (বিনয়, ২০১১ : ২৩২)

তিনি আরও বলেন, "যে-কাজে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই তা আমি নিজে যেমন সমর্থন করি না, তেমনি সরকারকেও তা করতে পরামর্শ দিতে পারি না" (বিনয়, ২০১১ : ২৩২)। বিদ্যাসাগরের এই উক্তিটি তাঁর কর্মকৌশল বোঝার জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি, যে কাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, সে কাজ মহৎ উদ্দেশ্যে করা হলেও বিদ্যাসাগরের তাতে উৎসাহ ছিল না। একারণে নারীদের জন্য নর্মাল স্কুল খোলার ক্ষেত্রে তিনি সাড়া দেননি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরামর্শকে আমলে না নিয়ে কার্পেন্টারের ইচ্ছায়

সরকার বেথুন স্কুলে নর্মাল স্কুল চালু করেন ১৪৬৯ সালে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের আশঙ্কা সত্য হয়। প্রত্যাশানুযায়ী ফল না পাওয়ায় ১৯৭২ সালে বেথুন স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে বাস্তব প্রতিবেশজ্ঞান ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি বিদ্যাসাগরের সংস্কারপরিকল্পনাকে সফল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

সমাজসংস্কার : বিধাববিবাহ আইন

ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এবিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি" (ইন্দ্র, ২০০১ : ৩০০)। উপর্যুক্ত উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করাকে বিদ্যাসাগর কতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন। তবে বিদ্যাসাগরই প্রথম বিধবাবিবাহের উদ্যোগ নিয়েছেন তা নয়। বিধবাবিবাহের প্রচলনচেষ্টা বিদ্যাসাগরের পূর্বেও অনেকেই করেছিলেন। রাজা রাজবল্লভ ১৭৬০ সালে তাঁর বিধবা কন্যার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দ্রাবিড়, কাশি, মিথিলা অঞ্চলের পণ্ডিতদের কাছে 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়' মর্মে বিধান পর্যন্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পণ্ডিতগণ, রাজার গোপনাদেশের কারণে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করলে সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'তেও (১৮১৫) বিধবাদের বিয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হতো। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য ছোটো ছোটো উদ্যোগ নেন। নানা কারণে এসব উদ্যোগ সফল হতে পারেনি।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন সফল করার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অন্যতম কৌশল ছিল কোনো ধর্মীয় বিতর্কে পক্ষাবলম্বন না করা। সে সময় মিশনারির মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার তুঙ্গে। সনাতন ধর্মের রক্ষণশীলরাও তাদের ধর্মীয় আচারকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছেন। অপরপক্ষে ইয়ংবেঙ্গল দলের নাস্তিকতায় আস্থা ও ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নানা আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি করেছে। আবার রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসারও তখন ঊর্ধ্বমুখী। এরকম পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগর যদি কোনো পক্ষ অবলম্বন করতেন, তাহলে বাকি পক্ষগুলো হয়তো তাঁর সংস্কার-উদ্যোগকে সন্দেহের চোখে দেখতো। ফলে এই সংস্কারকর্ম বিঘ্নিত হত। তাই হয়তো বিদ্যাসাগর নিজের ধর্মমত নিয়েও যেমন সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি, তেমনি কোন ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষেও বক্তব্য প্রদান করেননি। এ বিষয়ে ঋষি দাস বলেন :

> ধর্ম সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে নীরব রইলেন। তাঁর এই নীরবতার জন্য তাঁকে অনেকে নিরীশ্বরবাদী বলতেও কুণ্ঠিত হলেন না। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সংস্কার বা কুসংস্কার ছিল সর্বজনীন। তাই ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকে তিনি সর্বদা পৃথকভাবে দেখতেন। (ঋষি, ১৯৭১ : ৪৯)

বিশেষ করে, বিধবা বিবাহ প্রথা শুরু করার জন্য সনাতন সমাজের চোখে শত্রু হয়ে গেলে তাঁর সংস্কারপ্রচেষ্টা সফল করা কঠিন হয়ে যেত। এ কারণে সনাতন ধর্মের সকল আচারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তিনি কথা বলেননি। বিধবাবিবাহ চালু করার জন্য যেটুকু আচার ও প্রথা নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন, ভালোভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে সেটুকু অংশ নিয়েই বিতর্ক করেছেন পত্রিকায়। এগুলোও তাঁর প্রজ্ঞাময় কৌশলের অন্যতম প্রকাশ হিসেবে আমরা বিবেচনা করতে পারি।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুরু করার আগে বিদ্যাসাগর আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন এবং সে কৌশল যে সুচিন্তিত ছিল, তা আমরা বুঝতে পারি তাঁর 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' (১৮৫৫) পুস্তিকার সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে। এখানে তিনি বলেছেন যে, বিধবাবিবাহ চালু করতে গেলে রক্ষণশীল সনাতন সমাজকে আগে এই কাজটিকে তাদের কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করাতে হবে। আর আচার ও শাস্ত্রনির্ভর তৎকালীন সমাজকে যে যুক্তির মাধ্যমে বিধবাবিবাহকে কর্তব্য হিসেবে স্বীকার করানো যাবে না, তা তিনি জানতেন। তিনি এও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শুধু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়েই তাদেরকে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা বোঝানো সম্ভব :

> কিন্তু যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনই ইহাকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশের শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই কর্ত্তব্যকর্ম্ম। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম এই বিষয়ের মীমাংসা করাই অগ্রে আবশ্যক। (উদ্ধৃত, বিনয়, ২০১১ : ২৪৬)

একারণে সনাতন ধর্মের আচার ও সংস্কার সম্পর্কে উদাসীন বিদ্যাসাগর নতুন করে প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ ঘেটে বিধবাবিবাহের পক্ষে তথ্য ও ব্যাখ্যা খুঁজে বের করলেন। তারপর সেসব তথ্যকে সুসংবদ্ধ করে রূপ দিলেন উপর্যুক্ত পুস্তিকায়। আর ধর্মশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য এসময় তিনি রাতেও কলেজেই থাকতেন।[৮] তাঁর এই তথ্যসমৃদ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত, কৌশলী রচনাগুলো বিধবাবিবাহের পক্ষ-বিপক্ষের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উক্ত পুস্তিকাটি এত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংস্করণের দুই হাজার কপি শেষ হয়ে যায়। এই বই প্রকাশের পর রক্ষণশীল পণ্ডিতরা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। বিধবাবিবাহকে আইনগত বৈধতা দেওয়ার কাজ করতে গিয়ে তাঁর শত্রু বেড়েছিল। এই গ্রন্থের প্রতিবাদে তারাও বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেন– যেখানে বিদ্যাসাগর প্রদত্ত যুক্তিখণ্ডনের চেয়ে তাঁর প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটূক্তি প্রাধান্য পেয়েছে। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর বিধবাবিবাহ আন্দোলন গতিশীল হলেও এর বিরুদ্ধপক্ষও সরব হয়ে উঠে। উভয় দলের পক্ষে-বিপক্ষে নানা কবিতা, গান, ছড়া, পালাগান রচিত হতে থাকে। কিন্তু বিদ্যাসাগর শাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রমাণ করে দিলেন। ফলে বিদ্যাসাগরের সমর্থক ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু "বিদ্যাসাগর জানতেন, বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ করলেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা যাবে না। কারণ, বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করতে না পারলে বিধবা বিবাহের ফলে জাত সন্তানরা পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হবে না" (ঋষি, ১৯৭১ : ৫৭)। তাই তিনি ১৮৫৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিধবাবিবাহের পক্ষে ৯৮৭ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর নিয়ে সরকারের কাছে বিধবাবিবাহ বৈধতা দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করতে অনুরোধ করেন। সেই আইনে বিধবার পুনরায় বিবাহজাত সন্তান যেন সমাজে বৈধতা পায় সে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেন। কিন্তু বিধবাবিবাহের বিপক্ষে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ভারত সরকারের কাছে ৩৬,৭৬৩ জনের স্বাক্ষরসম্বলিত একটি দরখাস্ত জমা পড়ে ১৮৫৬ সালের ১৭ মার্চ। এরপরও ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়। একই সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিয়েতে বর ছিলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কনে কালীমতি দেবী। বিদ্যাসাগর নিজে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা তার নিজের পরিবারেও

বাস্তবায়িত করেছেন। ১৯৭০ সালের ৮ নভেম্বর তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভাবসুন্দরীর বিয়ে দেন। আত্মীয়স্বজনের আপত্তির পরেও এই বিয়েকে সানন্দে বরণ করেছেন তিনি। অবশ্য তাঁর পুত্রেরও এতে সম্মতি ছিল। ১৮৫৬ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত ১১ বছরে ৬০টি বিধবাবিবাহ দিতে তাঁকে ৮২,০০০ টাকা ব্যয় করতে হয়। এতে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এসব বিধবাবিবাহে যারা তাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন, তাদের অনেকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। ফলে তাঁকে বিপদাপন্ন হতে হয়েছিল। কিন্তু সমাজসংস্কারের মনোবল হারাননি তিনি। এসময় তাঁকে নানা রকম হুমকির শিকার হতে হয়েছে। আশঙ্কা ছিল তাঁর প্রাণনাশেরও। ফলে বিদ্যাসাগরের পিতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য লাঠিয়াল পর্যন্ত নিয়োগ করেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই হয়তো চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া থেকে সরে আসতো। কিন্তু দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগর একটুও ভয় পাননি। তিনি বুঝেছিলেন, দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলচিত্ত ও ভীরু সত্তা দ্বারা এত বড়ো সংস্কার কাজ অসম্ভব। তাই তিনি নির্ভয়ে তাঁর আন্দোলন চালিয়ে নিয়েছেন। বিদ্যাসাগরকে সামাজিক জীবনে নানা রকম ব্যঙ্গের শিকার হতে হয়েছে। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উচ্চশিক্ষিত বাঙালি তাঁর বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) উপন্যাসে সূর্যমুখীর মাধ্যমে বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলেছেন।[২] বিদ্যাসাগর স্বভাবে জেদি হলেও এসব ব্যঙ্গের সরাসরি কোনো জবাব দিতে যাননি। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজসংস্কারের বৃহৎ মহৎ কাজকে সফল করতে হলে মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে। সবার ব্যঙ্গের জবাব দিতে গিয়ে শক্তি ও সময় নষ্ট করলে সংস্কার কাজ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই ধৈর্য ধরে এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েছেন তিনি।

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা সংস্কার

'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে বিদ্যাসাগরের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল বারো বছর বয়সে। এটি বিদ্যাসাগরের প্রথম সামাজিক লেখা। এই লেখাটি খুব বেশি আলোচিত হয়নি। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর "বহুবিবাহ রহিত হওয় উচিৎ কি না– এতদ্বিষয়ক বিচার"। একই শিরোনামের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। বল্লালী আমলের কৌলীন্য প্রথার কারণে কুলীন ব্রাহ্মণরা বহুবিবাহের মতো অপকৃষ্ট প্রথায় আবদ্ধ ছিল। এই প্রথার বিরুদ্ধে ১৮৪২ সালে প্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় কলম ধরেছেন। ১৮৫৫ সালে প্রথম কিশোরীচাঁদ মিত্র বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণের আবেদন করেন। একই বছর বিদ্যাসাগরও অনুরূপ আবেদন করেন (গোপাল, ১৯৯১ : ৫০)। ক্রমে জনমত সৃষ্টি হতে থাকা এই আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কারণে। সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে ছিল। তাই সরকার নতুন করে বহুবিবাহ প্রথা রদ করে ধর্মীয় আবেগে আঘাত দিতে চাননি। "পরে ছোটলাট সিসিল বীডনের সময় (১৮৬৬) আবার নতুন করে চেষ্টা হয়। আবেদনেও হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষর ছিল, বিরোধীরাও সংখ্যায় সেরূপ" গোপাল, ১৯৯১ : ৫০)। সিপাহী বিদ্রোহের পর এই প্রথার সংস্কার বিষয়ে সরকারের উৎসাহ কম ছিল। তবুও সরকার সাত সদস্যের একটি কমিটি করেন। এই কমিটির পাঁচজন দেশীয় লোকের মধ্যে বিদ্যাসাগরও একজন ছিলেন। এই কমিটি মত দিলেন যে, বহুবিবাহ একটি কুপ্রথা– তাই এই প্রথা সময়ের সঙ্গে আপনা-আপনিই উঠে যাবে। বিদ্যাসাগর অবশ্য দ্বিমত পোষণ করে এই প্রথা বন্ধের আইন চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের অনিচ্ছার

কারণে সেই আইন প্রণিত হয়নি। তবুও বিদ্যাসাগর তাঁর স্বনামে ও বেনামে প্রকাশিত পুস্তিকার মাধ্যমে বহুবিবাহের বিপক্ষে লেখালেখি চালিয়ে যান। এভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে লেখালেখির মাধ্যমে জনমত তৈরির কৌশল অবলম্বন করেন তিনি।

উপসংহার

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে নানা রকম প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয়েছে। এসব প্রতিকূলতাকে দূর করার জন্য তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছে নানা কৌশলের। শিক্ষা সংস্কার করতে গিয়ে যখন তাঁর সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিতর্ক ও মানসিক অনৈক্য হয়েছে, তখন তিনি প্রথমে যুক্তি দিয়ে তাঁর অভিমতকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সেই যুক্তি কখনো কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, কখনো প্রতীয়মান হয়েছে ভ্রান্তরূপে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর নীতি ও আদর্শের জায়গায় কখনো ছাড় দেননি। প্রয়োজনে পদত্যাগ করে বরণ করে নিয়েছেন অর্থকষ্টকে। আবার ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অনেক সিদ্ধান্তে যেমন তিনি প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি সরকারের অনেক নীতিতেই সহযোগের মাধ্যমে সংস্কারকর্মকে এগিয়ে নিয়েছেন। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে ছিল বলে ধর্মগ্রন্থ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা ও বহুবিবাহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছেন। পারিপার্শ্বিক চাপ ও প্রাণনাশের ভীতিকে জয় করেই তিনি অব্যাহত রেখেছেন তাঁর সমাজসংস্কারের অগ্রযাত্রাকে। গভীর আত্মবিশ্বাস, অদম্য মানসিকতা, কঠোর পরিশ্রম ও বিচক্ষণ ভবিষদ্‌দৃষ্টির সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৌশলী হয়েছিলেন বলেই শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা একজন সফল বিদ্যাসাগরকে পেয়েছি।

টীকা

১. এ বিষয়ে বিহারীলাল সরকার বলেন : "রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিধবা-বিবাহের আন্দোলনকালে তিনি প্রায়ই সংস্কৃত কলেজেই রাত্রি যাপন করিতেন এবং নিজ মত সমর্থনার্থ নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন" (বিহারীলাল, ১৯৯১ : ১৪৮)।

২. বিষবৃক্ষ উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে সূর্যমুখী একটি পত্র লেখে কমলমণিকে। পত্রের এক জায়গায় সে বলে : "ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করেছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" (বঙ্কিম, ১৩৬০ : ১৭৯)

সহায়কপঞ্জি

ইন্দ্র মিত্র (২০০১)। *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
ঋষি দাস (১৯৭১)। *বিদ্যাসাগর*। অশোক প্রকাশন, কলকাতা।
গোপাল হালদার (১৯৯১)। *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর*। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৬০)। *বঙ্কিম রচনাবলী*। (প্রথম খণ্ড : সমগ্র উপন্যাস)। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
বিনয় ঘোষ (২০১১)। *বিদ্যাসাগর ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। অরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা।
বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০২০)। 'ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রশাসন ও বিদ্যাসাগরের যুদ্ধ'। *কালি ও কলম* (সপ্তদশ বর্ষ : নবম-দশম সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর)। সম্পাদক : আবুল হাসানাত। ঢাকা।
বিহারীলাল সরকার (১৯৯১)। *বিদ্যাসাগর*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।
শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯৮২)। 'বিদ্যাসাগর যুগ'। *বিদ্যাসাগর স্মৃতি*। সম্পাদক : বিশ্বনাথ দে। সাহিত্যম, কলকাতা।